বিজ্ঞান অন্বেষক -এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ১০ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

বিজ্ঞান অন্বেষক

(০ ২৫৮৫-০৬৩৯
১ ঘন্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৫ সংখ্যা ৩ মে-জুন /২০০৮ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

মারি কুরি
এক অনন্য বিজ্ঞান সাধিকা

গত সংখ্যার পর

পিয়েরে কুরি মিউনিসিপাল ইস্কুলে তাঁদের গবেষণার জন্যে একটা ভাঙাচোরা ওয়ার্কসপ (Workshop) মনোনীত করেন। সেই ছোটো ঘরে পিয়েরে এবং মারি প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে গবেষণায় মগ্ন হন। ইতিমধ্যেই মারির শরীরে লিউকেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই গবেষণাগারে মারি সব জানা মৌল নিয়ে গবেষণা করে দেখেন, ইউরোনিয়াম (Uranium) বাদে থোরিয়াম (Thorium) এর মধ্যে স্বল্প পরিমাণে এই রেডিওঅ্যাকটিভিটি রয়েছে। এরপরে তিনি সব প্রাপ্য আকরিক (Mineral) নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। মারি দেখেন যে কালো পিচ-ব্লেন্ড (Pitch blende) থেকে ইউরেনিয়ামের মতো এক ধরনের উজ্জ্বল রশ্মি নির্গত হচ্ছে; কিন্তু এগুলির শক্তি ইউরেনিয়ামের থেকেও বেশি। তিনি ভাবলেন— নতুন এক মৌলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। তারপর শুরু হলো পিচ-ব্লেন্ড থেকে নতুন মৌলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা।... চার বছর ধরে পিয়েরে আর মারি অমানুষিক পরিশ্রম করে পিচ-ব্লেন্ড থেকে পলোনিয়াম (Polonium এবং রেডিয়াম (Radium নামক

এর পর ৫ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন

গত সংখ্যার পর

উষ্ণায়নের প্রভাবে পৃথিবী জুড়ে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। বৃষ্টিপাতের বেশির ভাগটাই হবে প্রবল বেগে। বাড়বে ভূমিক্ষয় ও ধস। বন্যার প্রকোপ বেশি হবে। প্রবল বেগে বৃষ্টিপাতের ফলে বেশির ভাগটাই নিকাশী হবে। মাটি বৃষ্টির জল শুষে নেবার সময় পাবে না। ফলে ভৌমজলের ভাঁড়ার পূর্ণ হবে না। বৃষ্টিপাতের স্থান-কাল বদলে যাবে। মৌসুমি বায়ুর গতিপথ পালটে যাবে, বিশেষ করে আমাদের দেশে। ফলে মানুষ তার অতি প্রয়োজনীয় মিঠাজল পাবে না। বেশি উষ্ণতায় বাষ্পীভবন বেড়ে মাটির জলের পরিমাণ কমবে। ফসল উৎপাদন কমে যাবে। বনাঞ্চলে দেখা দেবে দাবানল। সেখানে পোকামাকড় ও রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়বে।

ব্রিটেনের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে এই শতাব্দের শেষের দিকে পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে দেখা দেবে চরম খরা— পূর্বের থেকে তীব্রতায় প্রায় ৭ গুণ বেশি। ফলত পৃথিবীর অনেক জায়গাই মরুর কবলে পড়বে।

কোন বিশেষ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত কোন বাস্তুতন্ত্র জলবায়ুর এই পরিবর্তনকে কীভাবে মানিয়ে নেবে তা এখনই বলা বেশ শক্ত। তবে মৎস্যচাষ, কৃষিকাজ ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেখানে বনসৃজন করা হয়, অর্থাৎ মানুষের ব্যবস্থাপনাই প্রধান বিষয়, সেখানে মানুষ জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে বা পরিবর্তন মানিয়ে নিতে কী ব্যবস্থা নেয় সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু বদলে গেলে বর্তমান প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র অবশ্যই প্রভাবিত হবে। প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীবের নানা পরিবর্তন দেখা দেবে। এদের জনন, আচরণ, অবস্থান এবং আন্তঃপ্রজাতি পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটবে। পৃথিবীর বনাঞ্চলগুলোও অন্যত্র সরে যেতে পারে। উত্তরে সুমেরুগত (বোরিয়াল) বনাঞ্চলের জায়গায় মিশ্র নাতিশীতোষ্ণ বনাঞ্চল দেখা দেবে। সুমেরুগত বনাঞ্চল আরও উত্তরে সরে গিয়ে তুন্দ্রা অঞ্চলে অবস্থান অবস্থান করবে। পুষ্টিচক্রে ওলোটপালোট হবে। তবে অনেকটাই নির্ভর করছে যে উষ্ণায়নের প্রভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এরা কতটা মানিয়ে নিতে পারবে তার ওপর।

জৈববৈচিত্র্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। সুমেরিয় তুন্দ্রা অঞ্চল লক্ষ লক্ষ জলজ পাখির জন্মস্থল। উষ্ণায়নে

এর পর ২ পাতায়

সুন্দরবনের বাঘ ও বাঘের অস্তিত্বের সংকট

নাম শুনলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয় আর দেখলে পিলে চমকে যায়। বাঘের ডাক বহুদূর থেকে শোনা যায় এবং ডাক শুনে আতঙ্ক ও শিহরণ জাগে। চেহারায়, চলনে, স্বভাবে ভীষণ হিংস্র ভাব ফুটে উঠে। সিংহের মত ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা এদের নয়। কিন্তু অভিজ্ঞ শিকারীদের মতে বাঘ জঙ্গলের প্রকৃত ভদ্রলোক। এদেশের বিখ্যাত শিকারী জীবপ্রেমী জিম করবেট (Jim Corbett) কয়েকটি অসাধারণ বই লিখে গেছেন 'কুমায়ুনের মানুষ খেকো', 'রুদ্র প্রয়াগের মানুষ খেকো', 'জঙ্গল লোর' (Jungle Lore) ইত্যাদি। তাঁর বই পড়ে জানা যায় যে বাঘ মাত্রেই হিংস্র নয়। প্রকৃতিক নিয়মে এরা মাংসাশী মাত্র। মানুষ তাদের স্বাভাবিক খাদ্য নয়। খৈরী নামের বাঘিনী নিয়ে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা রয়েছে, যা প্রমাণ করে বাঘ মানুষ খেকো নয়। এদের শরীর বেশ ভারী। বাঘ বন্যতার প্রতীক ও বাস্তু সংস্থানে কুশলকামী। বাঘকে সংরক্ষণ ও রক্ষা করে সমগ্র বাস্তুসংস্থানে বন্যতাকে সংরক্ষণ করা হয়। প্রকৃতিতে মানুষ ও তার গৃহপালিত জীবজন্তু ছাড়া বাকি বাস্তুসংস্থান হল বন্য। জীবনধারণ ব্যবস্থায় বন্যতা সংরক্ষণ হল

এর পর ৬ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন

১ পাতার পর

সেখানে বোরিয়াল বনাঞ্চল দেখা দিলে অর্ধেকেরও বেশি এই জলজ পাখিরা বিপন্ন হবে। ওয়ার্লড্ ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড (২০০০) হিসেব করে দেখেছে যে সুমেরিয় তুন্দ্রা অঞ্চলের ৪০-৫৭ শতাংশ অংশে যদি এভাবে বনাঞ্চল দেখা দেয় তাহলে ৪০-৫০ লক্ষ হাঁস এবং প্রায় ৭৫ লক্ষ ক্যালিড্রিড ওয়েডার পাখি এ শতকের শেষে তাদের বাসস্থান হারাবে। এরই মধ্যে বিপন্ন বেশ কিছু প্রজাতির পাখিদের, যেমন — রেড ব্রেস্টেড গুজ, তুন্দ্রা বিন গুজ, স্পুন-বিল্ড স্যান্ডপাইপার এস্পারার গুজ এবং গ্রিনল্যান্ড হোয়াইট ফ্রন্টেড গুজ, অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হবে।

ওয়ার্লড্ ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (২০০০) জানাচ্ছে যে উষ্ণায়নে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে এই শতাব্দের শেষ ভাগে বিভিন্ন প্রজাতির বাস্তুতান্ত্রিক বাসভূমির প্রায় ৩৫ শতাংশ ধ্বংস হবে। বিরল প্রজাতির বেশ কিছু প্রাণীর বাসভূমি প্রথমেই হারিয়ে যাবে চিরতরে, যেমন— ইথিওপিয়ার গেলাডা বেবুন, অস্ট্রেলিয়ার পার্বত্য পিগমি পোশাম, মেক্সিকোর মনার্ক প্রজাপতি এবং সুমেরিয় রাশিয়ার স্পুন-বিল্ড্ স্যান্ডপাইপার। এভাবে বাসভূমি ধ্বংস হওয়ার দরুন সুমেরু ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় ২০ শতাংশ প্রজাতি চিরতরে লুপ্ত হবে। পৃথিবীর যে অঞ্চলগুলি এরকম ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি সেগুলি হল পূর্ব সাইবেরিয়ার কিছু অঞ্চল, উত্তর আলাস্কা, কানাডার তৈগা বা সুমেরু প্রদেশিয় অঞ্চল, দক্ষিণ কানাডিয় সুমেরু দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর স্ক্যানডিনেভিয়া, পশ্চিম গ্রিনল্যান্ড, পূর্ব আর্জেন্টিনা, লেসোথো, তিব্বত মালভূমি এবং উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া। আর উষ্ণায়নে পৃথিবীর যে সব অঞ্চল সবচেয়ে বেশি বাস্তুতান্ত্রিক বাসভূমি হারাবে তারা হল উত্তর গোলার্ধের উচ্চ অক্ষাংশীয় অঞ্চল। ৪৫ শতাংশের বেশি নানান প্রজাতির বাসযোগ্য ভূমি হারাবে রাশিয়া, কানাডা, কিরঘিজস্তান, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, লাতভিয়া, উরুগুয়ে, ভুটান ও মঙ্গোলিয়া।

প্রবাল বেশি উষ্ণতা পছন্দ করে না। যে সব জলের তাপমাত্রা ১৮ - ৩০ সেলসিয়াসের মধ্যে এরা সেখানে থাকে। ৩০ সেলসিয়াসের চেয়ে তাপমাত্রা যদি আরও ১ -২ সেলসিয়াস বেড়ে যায় তাহলে এরা বেশ অস্বস্তি বোধ করে এবং জুজ্যানথেলি নামে একপ্রকার আণুবীক্ষণিক মিথোজীবী শ্যাওলা নিঃসৃত করে। এই বিশেষ শ্যাওলাটির জন্যই তাদের পুষ্টি হয়। দেহ এত রঙবাহারি হয়। জুজ্যানথেলি দেহ থেকে নিঃসৃত হয়ে গেলে তাদের রঙের বাহার নষ্ট হয়ে যায়। শুধু দেহকঙ্কালটি পড়ে থাকে। ধীরে ধীরে এরা মারা যায়। ভারত মহাসগর, লোহিতসাগর, ক্যারিবিয় সাগর, অস্ট্রেলিয়া, ফ্লোরিডা ও বাহামা-য় এভাবে প্রচুর ক্রান্তীয় প্রবাল ধ্বংস হয়েছে।

আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি ধনী দেশ টাকার জোরে প্রাযুক্তিক উন্নতি ঘটিয়ে এবং রাজনৈতিক ভাবে নানান সিদ্ধান্ত নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণায়নকে সামাল দেবে যদি না জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চরম কোন বিপর্যয় নেমে আসে। কিন্তু ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের গরিব দেশগুলো বেশ বিপদের মুখে পড়বে। আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল একুশ শতকের পরে যে উষ্ণায়ন কমে যাবে বা জলবায়ুর আর কোনও পরিবর্তন হবে না এমন নিশ্চয়তা কোথায়। কারণ উষ্ণায়ন জনিত জলবায়ু পরিবর্তনকে স্থিতিশীল করারঅর্থ বাতাসে গ্রিন গ্রিন হাউস গ্যাস মেশার পরিমাণ প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনা। কার্যত এটি প্রায় অসম্ভব। অন্তত নানান তথ্য আমাদের তাই জানাচ্ছে। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে ২১০০ সালে বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ স্থিতিশীল করা যাবে, তাহলেও বিপদ কিন্তু কাটছে না। কারণ এ সময়ের মধ্যেই সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়তে পারে ১০-৯০ সেন্টিমিটার। পরবর্তী কয়েক শতকে এটি সমুদ্রের তাপীয় প্রসারণে ও মেরুর বরফ গলে আরও ১ থেকে ২ মিটার উঁচু হতে পারে। পৃথিবী জুড়ে উষ্ণায়নে সমুদ্রজল উত্তপ্ত হয়ে এবং মেরুর বরফ গলে বিগত ১০০ বছরে এর মধ্যেই সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়েছে প্রায় ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। আর এই বাড়ার হারটি কিন্তু বজায় রয়েছে। সমুদ্রতলের উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে বিধ্বংসী ক্রান্তীয় ঝড় ও বন্যা দেখা দেবে। ফলে একুশ শতক নাগাদ পৃথিবীর নিচু উপকূলীয় অঞ্চলে (সমুদ্রতল থেকে ১০ মিটার বা তার কম উঁচু) বসবাসকারী প্রায় ৬৪ কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন হবে। উষ্ণায়নের প্রভাবে মহাদেশীয় হিমবাহ গলে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। পশ্চিম কুমেরুর বিস্তীর্ণ বরফ স্তরে বেশ কয়েক লক্ষ কোটি টন জল জমে বরফ হয়ে আছে। অতীতে উষ্ণায়নের প্রভাবে গলে গিয়ে এটি সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়িয়েছিল প্রায় ৪-৬ মিটার। এরকম ঘটনা আবারও ঘটতে পারে। এমনই ভাবে গ্রিনল্যান্ডের বিস্তীর্ণ বরফ গলে গিয়ে সমুদ্র জলের উচ্চতা ৭ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। উপকূলীয় বন্যা এ সবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

জলবায়ু বদলে গেলে সমুদ্রস্রোতের গতি-প্রকৃতি পাল্টে যেতে পারে। উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে গভীর সমুদ্রের মিথেন জালিক-কে বিয়োজিত করবে। ফলে বাতাসে আরও বেশি পরিমাণে গ্রিন হাউস গ্যাস মিথেন মিশবে। উষ্ণায়নের ফলে মেরুর বরফ গলে সমুদ্রে মিশে সমুদ্রজলের উষ্ণতা-লবণতার পরিবর্তন ঘটাবে। উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোতের প্রভাবে উত্তর ইউরোপ উষ্ণ থাকে। উষ্ণায়ন ক্রমশ বাড়লে এই সমদ্রস্রোতের উষ্ণতা-লবণতার মাত্রায় পরিবর্তন ঘটে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ক্রমশ শীতল হতে পারে।

ব্রিটেন এর হ্যাডলি সেন্টার জানাচ্ছে যে সুমেরু বৃত্তে অবস্থিত নরওয়ে উপকূলের লোফোটেন দ্বীপে সমুদ্রের ওপর শীতকালে কুয়াশা ছেয়ে থাকে। কুয়াশা হওয়ার কারণ হল সমুদ্রের জল তার ওপরের বাতাসের চেয়ে বেশ কয়েক ডিগ্রি বেশি উত্তপ্ত। ফলে বাতাসের জলীয় বাষ্প সহজেই ঘনীভূত হয়ে যায়। সুমেরু বৃত্তে অবস্থিত হয়েও লোফোটেন দ্বীপ উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে বাসযোগ্য। উসাগরীয় স্রোত উত্তর ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে উষ্ণ রাখে। কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণায়ন এ অঞ্চলের জলবায়ুকে ক্রমশ বদলে দিচ্ছে। এতটাই বদলে দিচ্ছে যে ১০০-২০০ বছরের মধ্যে এ অঞ্চলের জলবায়ুর সঙ্গে শীতল সাইবেরিয় জলবায়ুর আর তফাত না-ও থাকতে পারে। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে উষ্ণায়নের প্রভাবে উত্তর মেরুর চিরতুষার গলছে। ফলে উপসাগরীয় স্রোত ক্রমশ আরও ডান দিকে সরছে। এরকম চলতে থাকলে উপসাগরীয় স্রোতের গতি ক্রমশ কমে আসবে বা তা থেমেও যেতে পারে। এটি ঘটলে শীতকালে উত্তর ইউরোপের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাপমাত্রা আরও প্রায়

এরপর ৩ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন

২ পাতার পর

১০০ সেন্টিগ্রিড বা তারও বেশি নেমে যাবে। কারণ গ্রিনল্যান্ড সাগরের বরফ জমা জলে উপসাগরীয় স্রোতের তরল উত্তালনকারী শক্তি কাজ করে। এই সাগরের জল যখন জমে বরফ হতে শুরু করে তখন বাকি জলের ঘনত্ব ও লবণতা খুব বেড়ে যায়। ফলে শীতল, নোনা জল ক্রমশ মহাসাগর তলে নেমে যায় এবং দক্ষিণ মেরুর দিকে এঁকেবেঁকে এগোতে থাকে। এর প্রভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ জল উত্তর মেরুর দিকে যায়। বিভিন্ন প্রকার সমুদ্র স্রোত পৃথিবীর নানান অংশের তাপমাত্রার এক বিশালাকার বাহক বলয়। এই সমুদ্র স্রোতগুলির এক অংশ হল উপসাগরীয় স্রোত। এই স্রোতটি পৃথিবীর এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অংশে প্রবহমান। কিন্তু উষ্ণায়নের ফলে উত্তর মেরুর বরফ গলা জল ক্রমশ যদি সমুদ্রে মিশতেই থাকে, তাহলে মেরু সাগরের জলের মহাসাগরের তলদেশে নেমে যাওয়া থেমে যেতে পারে। এমনকী, ফলত, উপসাগরীয় স্রোতের তরল উত্তোলনকারী শক্তি হ্রাস পেতে বা বন্ধ হতেও পারে। পৃথিবীর তাপমাত্রার বর্তমান গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে উপসাগরীয় স্রোত দুর্বল হয়ে পড়লে উষ্ণায়নের প্রভাবে যে কোন অঞ্চলের শীতলতা অনেক কমে যাবে। কিন্তু উপসাগরীয় স্রোত যদি একেবারে থেমে যায় তাহলে এর প্রভাবিত গোটা অঞ্চলেই নেমে আসবে এক অসহনীয় দীর্ঘ শীতকাল। আর পরিবেশের ওপর এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। ভারতের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহও এমনকী এর ফলে বিঘ্নিত হতে পারে।

উষ্ণায়নের ফলে মশার প্রাদুর্ভাব বেশ বাড়বে। ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের উঁচু জায়গাগুলিতে যথেষ্ট ঠান্ডার জন্য সাধারণত মশা থাকে না। কিন্তু উষ্ণায়নের ফলে এসব অঞ্চল ক্রমশ মশার বাসযোগ্য হচ্ছে। দেখা গেছে যে ক্রান্তীয় অঞ্চলে যে উচ্চতায় আগে জল জমে বরফ হত, বিগত ৩০ বছরে, তার থেকে আরও প্রায় ৫০০ ফুট উঁচুতে উঠলে তবে জল জমে বরফ হচ্ছে। আর এসব অঞ্চলেই সম্প্রতি হাউস ইজিপ্টাই মশা বাহিত রোগ ডেঙ্গু ও পীতজ্বর দেখা দিয়েছে। ম্যালেরিয়াও ছড়াচ্ছে ব্যাপকভাবে। জলবায়ু বদলে যাওয়ায় পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান নদীও নিশ্চিহ্ন হতে পারে। পৃথিবীর প্রায় ১০টি প্রধান নদী এরকম বিপন্নতার মুখোমুখি। এশিয়া মহাদেশে সিন্ধু নদ এবং আফ্রিকা মহাদেশে নীল নদ এদের অন্যতম। সিন্ধু বরফ গলা জলে পুষ্ট। **আই পি সি ওয়ার্কিং গ্রুপ** এর দ্বিতীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়ের হিমবাহ গলে যেতে পারে। এরকমটি ঘটলে সিন্ধু নদ চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। নীল নদ অববাহিকায় বাষ্পীভবনের হার এমনিতেই বেশি। আরও উষ্ণায়নের ফলে ক্রমশ বাষ্পীভবনের হার বেড়ে গেলে আফ্রিকার প্রাণস্বরূপ এই নদটির টিকে থাকা বেশ মুশকিল হবে। অন্যান্য যে সব নদনদী এমনই বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে তারা হল ইয়াংসি, মেকং, সালুইন, গঙ্গা, দানিয়ুব, লা প্লাটা, রিয়ো গ্র্যান্ড-রিয়ো ব্রাভো এবং মারে ডার্লিং।

অতি মাত্রায় জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানোর মারাত্মক কুফল এরই মধ্যে পরিবেশের ওপর পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে ২০০৩ সালে ইউরোপে যে তাপপ্রবাহ চলেছিল তার কথা বলা যায়। আগের উষ্ণতম বছরের তুলনায় এর উষ্ণতা ২° সেলসিয়াস বেশি ছিল। সাধারণভাবে এরকম আগুন ঝরানো গ্রীষ্মকাল প্রতি ৮০০ বছরে একবার আসে। এই তাপপ্রবাহে ইউরোপের প্রায় ৩০,০০০ জন মানুষ মারা যায়। অঙ্কের হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৩.৫ বিলিয়ন ইউরো মুদ্রা। আবহবিজ্ঞানীদের আশঙ্কা ক্রমশ উষ্ণায়নের প্রভাবে ২০৪০-এর দশকেই প্রতি ২ বছর অন্তর একবার এরকম বা এর থেকেও বেশি উষ্ণ বছর আসতে পারে। ব্রিটেনের পৃথিবী বিখ্যাত আবহাওয়া দপ্তর **হ্যাডলি কেন্দ্র** জানিয়েছে যে মানুষের নানা কাজে পৃথিবীর সব কটি মহাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড মেশা কতটা কমানো যাবে

ওপরের জিজ্ঞাসার উত্তরটি আর একটি জিজ্ঞাসা দিয়েই শুরু হয়। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সবচেয়ে সুবিধাজনক (অপটিম্যাল) মাত্রাটি কী? এবং বর্তমান অবস্থা থেকে কত তাড়াতাড়ি আমরা সেই অবস্থায় যেতে পারব? ৬০,০০০ বছর আগে শেষ হিমযুগ থেকে শুরু করে প্রাক্-শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়, এমনকী বিংশ শতাব্দের শেষ পর্বের বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের তথ্য আমাদের হাতে আছে। এই দীর্ঘ সময়ে দেখা গেছে যে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রার তফাত ঘটেছে। বেশ কিছু পরিবেশ বিজ্ঞানী প্রাক্-শিল্পবিপ্লব সময়ে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রাকেই (২৭০-২৮০ পি পি এম) সবচেয়ে সুবিধাজনক মাত্রা বলে মানার পক্ষপাতী। আরও এক ধাপ এগিয়ে কিছু পরিবেশবিদ বলছেন যে আমাদের প্রাক্-শিল্পবিপ্লব সময়ের উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থাতেই নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু এই মতটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলে তেমন কল্কে পায়নি। বরং একটা বিকল্প মত উঠে এসেছে যে বাতাসে বর্তমানে কার্বন ডাই-অক্সাইড মেশার যে পরিমাণ সেটিকেই লক্ষ্মণরেখা ধরা হোক। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড মেশার মাত্রা যাতে এই রেখাটি পেরোতে না পারে সেদিকেই নজর দেওয়া হোক। এইটিই কিয়োটো খসড়ার (১৯৯৭) মূল বক্তব্য। অবশ্যই পরবর্তীকালে বর্তমান মাত্রা থেকেও বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। আর তার জন্য নানান প্রস্তাবও বিভিন্ন সময়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন- ব্রিটেন এর **রয়্যাল কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট পলিউশন** (আর সি ই পি, ২০০০)-এর প্রতিবেদন, **এনার্জি হোয়াইট পেপার** (ডি ট আই, ২০০৩) এবং **আই পি সি সি-র** প্রতিবেদন (২০০১, ২০০৭ এপ্রিল)।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাস মেশার মাত্রা কমানোর প্রচেষ্টার সময় প্রথমেই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোকে আরও কিছুটা বর্ধিত মাত্রায় স্থিতিশীল করার কথা ভাবা দরকার। আর এখানেই দেখা দিয়েছে সমস্যা। কেননা আজ পর্যন্ত বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের এমন কোন আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া যায়নি যা পেরোলে পরে মারাত্মক রকম জলবায়ু পরিবর্তন ঘটবে। বাতাসে বর্তমানে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ৩৭৯ পি পি এম। আমরা যদি বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ৫৫০ পি পি এম-এর ওপরে যেতে দিই, তা হলে পৃথিবী জুড়ে উষ্ণতা বাড়বে ২°-৫° সেলসিয়াস। উষ্ণতা বৃদ্ধির শেষ ধাপটিতে জলবায়ুর মারাত্মক রকম পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী জুড়ে নেমে আসবে নানান প্রাণঘাতী বিপর্যয়। আবার, বাতাসের বর্তমানের কার্বন ডাই-অক্সাইডের

এরপর ৪ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন

৩ পাতার পর

ঘনত্বকে যদি স্থিতিশীল করে দেওয়া যায়, তা হলেও জলবায়ু ব্যবস্থার জড়তা বা জাড্যের জন্য পরবর্তী কয়েক দশকে কম করে এখনকার চেয়ে আরও ০.৫ সেলসিয়াস উষ্ণতা বাড়বে। আর এটিই যদি চলতে থাকে, তবে ২১০০ সাল নাগাদ, আই পি সি সি-র (২১০০) মতে, উষ্ণতা বাড়বে প্রায় ১.৪ -৫.৮ সেলসিয়াস।

ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়র্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউ এন এফ সি সি)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথিবী জুড়ে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমানোর জন্য একমাত্র যে চুক্তিটি বর্তমানে রয়েছে তা হল **কিয়োটো খসড়া**। এই খসড়ায় স্বাক্ষরকারী দেশগুলোকে ১৯৯০ সালে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস যে পরিমাণ ছিল তার থেকে ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে আরও ৫ শতাংশ কমাতে বলা হয়েছে। এই খসড়াতে কার্বন কেনাবেচারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এতে প্রতিটি দেশ তাদের নির্দিষ্ট মাত্রার গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের বাইরে গিয়েও অন্যান্য দেশের অব্যবহৃত গ্রিন হাউস গ্যাসের লক্ষ্যমাত্রাটিকে কিনতে পারবে। এরই একটি অন্যতম বিশেষ রূপ হল **ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম** (সি ডি এম)। এটি ২০০৮ সাল থেকে লাগু হবে। এই সি **সি ডি এম** পদ্ধতিতে কোন একটি বিশেষ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশ, যেমন— আমেরিকা, তার নির্গমনের কিছু অংশ উন্নতিশীল দেশগুলোকে কার্বন কমানোর প্রযুক্তি দেওয়ার বদলে বিনিময় করতে পারবে। পৃথিবী জুড়ে বাতাসে যে পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস মেশে তাতে উন্নতিশীল দেশগুলোর অবদান ৪০ শতাংশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনে এদের কতটা ভূমিকা রয়েছে তা তর্কের বিষয়। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে ধনী দেশগুলো তাদের **সি ডি এম** প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রার ফাঁস থেকে কিছুটা মুক্তি পেল। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছে যে তার দেশের যে সব কোম্পানি তাদের গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রাটি বজায় রাখতে পারবে, তা সে অন্যের অতিরিক্ত মাত্রাটি কিনেও হোক না কেন, তাকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শক্তি সম্পদ ব্যবহার করার যে রাজস্ব রয়েছে—**ক্লাইমেট চেঞ্জ লেভি** তা থেকে ৮০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। ২০০৫ সাল থেকে গোটা ইউরোপ জুড়ে এ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিয়োটো খসড়ায় স্বাক্ষরকারী আর সব দেশেও এ জিনিস চালু হয়েছে বা হতে চলেছে। আর এ ব্যাপারে বলার কোন অপেক্ষাই রাখে না যে বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলোই এতে সবচেয়ে লাভবান হবে। কার্বনডাই অক্সাইড কমানোর এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কার্বন এক পণ্যে পরিণত হল। আর সব সামগ্রীর মতো এরও একটি নির্দিষ্ট দাম থাকবে। কেনাবেচা হবে। অর্থনীতি অনুযায়ী বাজারের চাহিদা-জোগান তত্ত্ব মেনেই এর দাম ঠিক করা হবে। আর যখনই দাম দিয়ে কার্বনের কেনাবেচা শুরু হবে তখনই এটি একটি সামাজিক পণ্য হবে।

পৃথিবী জুড়ে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অতিরিক্ত ঘনত্বের জন্য নানাপ্রকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। এর জন্য বিশেষ করে বিংশ শতাব্দের অর্থনীতির পরিবর্তনের দিকে আঙুল তোলাই যায়। ১৯০০ সালের চেয়ে বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা তিন গুণের বেশি বেড়েছে। শক্তি সম্পদের চাহিদা (বিশেষ করে জীবাশ্ম জ্বালানি) বেড়েছে দশ গুণেরও বেশি। ভোগবাদী জীবনযাত্রার প্রভাবে, যেভাবে নানান সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে, জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণায়ন জনিত জলবায়ু বদলে যাওয়ার বিষয়টির সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই তাই পৃথিবীর সকল রকম প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য বন্টনের প্রশ্নটিও জড়িয়ে আছে।

বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডের নির্গমন কমানো মানেই গরিব বা উন্নতিশীল দেশের উন্নয়নের রথের গতি কমে আসে এরকম এক ভুল ধারণা রয়েছে। ধারণাটি মোটেও ঠিক নয়। জলবায়ু বদল রোধ করতে পারলে বরং আর্থিক সুযোগ সুবিধা বাড়ে। জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। ২০০৬ সালের শেষ দিকে নাইরোবিতে জলবায়ু নিয়ে এক অধিবেশন বসেছিল। সেখানে স্যার নিকোলাস স্টার্ন আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে এখনই যদি বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমানোর ব্যবস্থা না হয় তাহলে শিল্প বিপ্লবোত্তর কালের চেয়ে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা প্রায় ৫° সেন্টিগ্রেড বেশি বেড়ে যাবে। আর এটি বছরে কমপক্ষে ৫ শতাংশ স্থূল আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি ডি পি) হ্রাসের সমান হয়ে দাঁড়াবে। পরিবর্তে, পৃথিবী জুড়ে বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কমাতে প্রযুক্তিগত যে খরচ পড়বে তা বিশ্ব স্থূল আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ১ শতাংশ। সাম্প্রতিক কালে এক মার্কিন সংস্থা হিসেব কষে দেখেছে যে পৃথিবীর মাত্র ১ বছরের আর্থিক উন্নতিটুকু ছাড়তে পারলে পরবর্তী চার বছরের জন্য বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ কমানো যাবে। ফলে পৃথিবীও আরো উষ্ণতার হাত থেকে রক্ষা পাবে। স্টার্ন হিসেব করে দেখেছেন যে পৃথিবী যদি নিচু মাত্রার কার্বন অর্থনীতির দিকে ঝোঁকে তাহলে বছরে টাকার অঙ্কে মোট বাস্তুতান্ত্রিক লাভ ৫২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কথা শোনার মতো পরিবেশ মন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী কোথায়?

বর্তমানে পৃথিবীর কিছু দেশ জীবাশ্ম জ্বালানির বদলে পুনর্ভর শক্তির উৎসের খোঁজ করছে। বা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লা চালিত এমন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে যেখান থেকে কোন কালো ধোঁয়া বেরিয়ে বাতাসে মিশবে না বা মিশলেও তার পরিমাণ হবে অতি সামান্য। আর এ সমস্ত কিছুই তারা করছে কেবল শক্তি সাশ্রয়ের জন্য নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব থেকে তাদের নিজের দেশের সুরক্ষার জন্য।

শেষের কথা

জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সকলের কাছেই এক সমস্যা বা সঙ্কট। সম্ভবত এটি পৃথিবী জুড়ে মাথা চাড়া ওঠা উগ্রপন্থী সমস্যার চেয়েও বড় সংকট।

এরপর ৫ পাতায়

পত্রিকা যোগাযোগ

বিজ্ঞান দরবার-কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম।

মো: ৯৪৩৪২১২০৪২। জলপাইগুড়ি— তপন সেন, সেন ফার্মেসী, রেল বাজার আলিপুর দুয়ার জং। কলকাতা : বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-৭৩। চন্দন রায়/ চন্দন সুব্রভি দাস, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ২/১৪৫, বিজয়গড়, যাদবপুর, কল-৩২। মো: ৯৮৩১৬৯৩০৩৮

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন

৪ পাতার পর

কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন পৃথিবীর ধনী ও গরিব দেশের তফাতটি আরও স্পষ্টভাবে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। উর্বরা জমি, মিঠাজল সহ পৃথিবীর আরো নানা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটতে থাকায় মানুষ আরো বেশি ভাবতে শুরু করেছে। জলবায়ু পাল্টে যাওয়ায় পৃথিবীর নানান অঞ্চলে মানুষ তার ভিটেমাটি ও নিজস্ব জীবিকা হারিয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন শ্রেণি **পরিবেশ শরণার্থী** পরিণত হয়েছে।

ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইম্যাটিক চেঞ্জ এ বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে খোলাখুলি বলা হয়েছে যে মানুষের নানান কাজ যে জলবায়ুকে এতদিন মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ বা তর্কের অবকাশ নেই। বরং এখন প্রশ্ন হল কী করে জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ করা যায় তার উপায় খোঁজা। আর এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছার ওপর যে তাঁরা বাতাসে কতটা পরিমাণ কার্বনডাই-অক্সাইডের নির্গমন কমাতে রাজি হবেন শিল্পায়নের ইঁদুর দৌড় থেকে বিরত হয়ে। সমাজের বিভিন্ন স্তরেই বা তাঁরা কতটা আবেদন করবেন বসুধাকে আর তপ্ত না করার জন্য।

অনেকটাই কিন্তু এ ব্যাপারে দেরি হয়ে গেছে। এখনই পৃথিবী জুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। পরবর্তী কয়েকটি দশকের মধ্যে বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমাতেই হবে। না হলে প্রাণময় এই বসুধা বদলে যাবে এমন কোন গ্রহে যা মানুষের ভাবনার বাইরে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে বর্তমানে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা অতি সঙ্কটের চৌকাঠ থেকে আর মাত্র ১ সেলসিয়াস দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চৌকাঠটি যাতে পেরোতে না পারে তার জন্য এই শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন অর্ধেক করে ফেলতেই হবে। কিয়োটো খসড়া অনুযায়ী ২০০৮-১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের চেয়ে বাতাসে ৫ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তার বদলে ব্রিটেন লক্ষ্যমাত্রাটি রেখেছে ১২.৫ শতাংশ, জার্মানি রেখেছে ২১ শতাংশ, রাশিয়া ও ফ্রান্স ১৯৯০ সালের মাত্রাটিকেই বজায় রাখার কথা ঘোষণা করেছে। কানাডা, ইতালি ও জাপান যথাক্রমে ৬ শতাংশ, ৬.৫ শতাংশ ও ৬ শতাংশ হারে ১৯৯০ সালের তুলনায় বাতাসে কম গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের যে লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল তা রাখতে পারেনি। ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালের মে মাসে কানাডার গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ ২২.৬ শতাংশ বেশি ছিল। ইতালি ও জাপানের বেলায় ২০০২ সাল পর্যন্ত গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৮ শতাংশ ও ১২.১ শতাংশ বেশি ছিল। ২০০৩ সালে প্রকাশিত এনার্জি হোয়াইট পেপার অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের চেয়ে বাতাসে ৬০ শতাংশ কার্বনডাই-অক্সাইড কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছে। বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে বহুজাতিক সংস্থা তথা তৃণমূল স্তরের সকলের একমাত্র অঙ্গীকার হওয়া উচিত। না হলে একমাত্র প্রাণময় এই গ্রহটিকে আর বাঁচানো যাবে না।

— রাহুল রায়, শিক্ষক ও পরিবেশ কর্মী। মো: ৯৪৩৩৯৪৬১২০

মারি কুরি

১ পাতার পর

দুটি মৌল আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। পলোনিয়াম তাঁর স্বদেশের নামানুসারে করা হয়। রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয় ক্ষমতা, ইউরেনিয়ামের থেকে প্রায় দেড়লক্ষ শতাংশ বেশি। এই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে মারি, পিয়েরে এবং হেনরি বেকারেলের সঙ্গে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে অসুস্থতার জন্যে তিনি স্টকহোম গিয়ে এই প্রাইজ নিতে পারেননি। খ্যাতি এবং সম্মানের তোরণদ্বারে তাঁরা পৌঁছে যান কিন্তু এতেও তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হলো না। কথিত আছে যে পিয়েরেকে সরকার একবার 'Legino of Honour' দিতে চাইলে তিনি গবেষণার জন্যে একটা উপযুক্ত গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল মারি কুরির জীবনে এক বিষম বিপর্যয় নেমে আসে। ওইদিন তাঁর স্বামী পিয়েরে যখন একটা মীটিং থেকে ফিরছিলেন কিছুটা অন্যমনস্কভাবে সেসময় একটা বিরাট ঘোড়ার গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি বিষমভাবে আহত হন এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনায় মারি বিহ্বল হয়ে যান। শোকে দুঃখে তিনি বেশ কয়েক বছর জগতের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন।

সময় মনের দাগ মুছিয়ে দেয়। মারিও ধীরে ধীরে শোক কাটিয়ে ওঠেন। এরপর তিনি অধ্যাপনায় এবং তাঁর দুই মেয়ের দেখাশোনায় সম্পূর্ণ নিজেকে ডুবিয়ে দেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি রসায়নবিজ্ঞানে (Chemistry) দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পান।... বিশুদ্ধ বেরিয়াম (Barium) পৃথকরণ ও তার পারমানবিক ভর নির্ধারণের জন্যে তিনি এই পুরস্কার পান। তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।... ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেখলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিয়াম ইনস্টিটিউট (Institute due Radium) গবেষণাকেন্দ্র সম্পূর্ণ হলো। মারি এই গবেষণাকেন্দ্রের প্রধান পদে অভিষিক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) মারি সাময়িকভাবে গবেষণাকেন্দ্র ত্যাগ করে হাসপাতালগুলিতে এক্স্-রেডিওগ্র্যাফি (X-Radiography) সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।... যুদ্ধ শেষ হলে (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে) তিনি আবার গবেষণাকেন্দ্রে ফিরে আসেন।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হার্ডিং (President Harding, Warren G.) আমেরিকার মহিলাদের দান হিসেবে একগ্রাম রেডিয়াম মেরিকে উপহার দেন। তিনি রেডিয়াম ইনস্টিটিউটের পক্ষে এই উপহার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় আর একগ্রাম রেডিয়াম তাঁকে উপহার দেওয়া হয় এবং তিনি তা ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ওয়ারস'র রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে দান করেন। উল্লেখ্য, মারির দিদি ব্রোনিয়া এই ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ছিলেন।

মারিকে অনবরত রেডিয়ামের সংস্পর্শে থাকতে হতো, তার শরীরের রক্তকোষে লিউকেমিয়া (Leukemia-disease in which there is an excess of white corpuscles in tissues and usually in the blood) দেখা দেয়।... এই রোগেই তিনি ০৪ জুলাই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াতা হন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানী (Physicist) এবং রসায়নবিজ্ঞানী (Chemist) হিসেবে তাঁর নাম কি কোনোদিন ভুলে যাবার?

—স্বপন কুমার দে

সুন্দরবনের বাঘ

১ পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় বাঘ সংরক্ষণ অতীব প্রয়োজনীয় ও অবশ্য করণীয় বিবেচ্য বিষয়। জর্জ অ্যাডামসনের কথায় —

শিকারির বন্দুক আর মানুষের বাস
করেছে লোপাট বাঘের আবাস
রণে ক্লান্ত যখন ভারত পশু
সহসা চেতনা পেল মনুষ্য সমাজ।

বাঘ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। রাইফেলের মুখে বাঘকে আর দেখা যায় না। ধীরে ধীরে মানুষ বাঘকে শোভিত পশু হিসাবে সম্ভ্রম করছে বা ড্রইং রুম বা বৈঠকখানায় ট্রফির চূড়ায় বাঘের মাথাকে আর চিত্রিত করছে না। বাঘ আমাদের জাতীয় পশু। ছোটদের ভয় দেখানোর জন্য বাঘের অবতারণা করে গল্প ফাঁদা হয়। বাঘ নিয়ে নানা গল্প লেখা হয়েছে 'শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী 'টুনটুনি আর বাঘের গল্প'' বই লিখেছেন। এই বইয়ে 'বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগ্নের 'চড়াই আর বাঘের কথা'', ''বাঘের উপর টাগ'', বাঘের পাল্কী চড়া'', ''বোকা বাঘ'', ''বাঘের রাধুনি'', ''বাঘের খোকা শিয়াল ছানা'', ''বাঘবর'' ইত্যেকার গল্প রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাঘের জনপ্রিয়তাকেই তুলে ধরা হয়েছে। আমরা সাধারণত চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখে থাকি। প্রকৃতিতে বাঘ দেখা ভগবান দর্শনের সামিল ও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়। ১৯৭০ সালে এদেশে বাঘ শিকার বা হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭২ সালে বাঘ শুমারীতে দেখা যায় এদেশে বাঘের সংখ্যা ১৮৭২ টি। ১৯৭৩-৭৪ সালে সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্পের সূচনা হয়। বাঘের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি বা মতভেদ আছে। হীরক রাজার দেশে নামে সত্যজিৎ রায় সিনেমা করেছেন এবং জীবন্ত বাঘকে রাজকোষের পাহারাদারে চিত্রিত করেছেন। এই রূপকের অর্থ অপরিসীম।

বাঘের বৈজ্ঞানিক নাম প্যানথারা ট্রাইগ্রিস (Panthera tigris)। বাংলায় বাঘ, হিন্দিতে শের আর মারাঠিতে ওয়াগ। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ম্যামেলিয়া শ্রেণীভুক্ত,মাংসাশী বর্গভুক্ত এবং ফেলিডা পরিবারভুক্ত। বাসস্থান ভারতের প্রায় সমস্ত বনাকীর্ণ জায়গায় দেখা যায়। ভারত ছাড়া, একদিকে কাসপিয়ান সাগর হয়ে মধ্য এশিয়া এবং সাইবেরিয়া হয়ে শাখালীন দ্বীপ বার্মা (মায়নসার) দক্ষিণপূর্ব জাভা, সুমাত্রা ও বাংলাদেশে বাঘ পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মমণ্ডলের বনভূমি ও তৃণঅঞ্চলে বাঘ বাস করে। লম্বায় ১০ ফুট ওজনে ২৮৮ কেজি। বাঘের শরীরের সামনের অংশ পিছনে অংশের থেকে বেশী পরিপুষ্ট। শিকারের সময় শরীরের সামনের অংশ থাবা, চোয়াল ইত্যাদি বেশী ব্যবহার করে। গায়ের রঙ সাদা থেকে হলুদ অথবা হাল্কা বাদামী হয়। সারা গায়ে কালো রঙের ডোরা কাটা দাগ থাকে। কিন্তু যে কোন দুটো বাঘের ডোরা কাটা দাগ একরকম হয় না। প্রত্যেকের ডোরা-কাটা দাগ আলাদা। অনেক সময়ে চোখের উপরের ভ্রূ ও গালের দাড়ি সাদা হয়। পুরুষ বাঘের কানের চার পাশে ও গালের লোম বড় হয়। বাচ্চাদের গায়ে বড় বাঘের মত ডোরাকাটা দাগ থাকে। প্রায় তিন বছর অবধি বাচ্চারা মায়ের কাছে থাকে। তিন বছর বয়সে এদের দুধের শ্ব-দন্ত পড়ে যায় এবং সেখানে আসল শ্ব-দন্ত গজায়। প্রথম তিন বছরে বাঘিনী শিকার ধরার কলা-কৌশল ও আদব কায়দা যতদূর সম্ভব বাচ্চাদের শিখিয়ে দেয়। বাচ্চা যদি ঠিকমত শিকার ধরা না শিখতে পারে, তাহলে বাঘিনীর হাতে তার ভালোভাবে প্রহার জোটে।

বাচ্চা হবার কিছু আগে, বাঘিনী বাঘের কাছ থেকে এমন জায়গায় পালিয়ে লুকিয়ে থাকে যে বাঘ হাজার খুঁজেও তার সন্ধান করতে পারে না। কারণ হচ্ছে, বাঘের একটা স্বভাব দোষ আছে। বাচ্চা দেখলেই তাকে মেরে ফেলা। বাচ্চা হবার পর বাঘিনী বাচ্চাদের কোন নির্জন ভাঙ্গা বাড়ি অথবা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রাখে। প্রত্যেকদিন পেট ভরে মাংস খেয়ে পরে বাচ্চাদের সামনে সেই অর্ধেক হজম হওয়া মাংস উগরে দেয়। মায়ের পায়ে পায়ে চলার মত জোর হলে সন্ধ্যার পর বাচ্চাদের নিয়ে শিকারে বের হয়। বাঘিনী শিকার করে, বাচ্চারা দেখে-শেখে। জনৈক শিকারির ভাষায় ''বাঘিনী বাচ্চাদের নিয়ে জানোয়ারদের পথ চলার রাস্তা বেয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। পথের দু'পাশে ঘন বন। মাঝে মাঝে থেমে কান খাড়া করে, কোন শব্দ না করে সামনে এগোতে লাগলো। পিছনের বাচ্চারা মাকে অনুসরণ করে, থেমে থেমে যেতে থাকে। অবশ্য শিকারের শব্দ শোনবার অথবা শুনে বোঝবার বয়স এখনো বাচ্চাদের হয়নি। খানিকটা খাবার পর একটা ছোট ডোবার কাছে এল। শিকার ধরার এটাই উপযুক্ত স্থান কেননা জন্তুরা এখানে জল খেতে আসে।

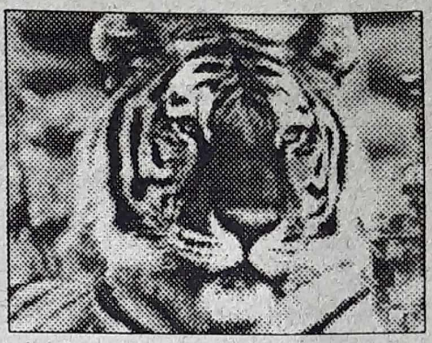

বাঘিনী রাস্তা ছেড়ে পাশে একটু দূরে সরে গিয়ে বড় বড় ঘাসের আড়ালে বসে পড়ল। বাচ্চাগুলি মার গা ঘেঁষে বসলো। একটা বাচ্চা এই সুযোগে একটু দুধ খাবার চেষ্টা করতে, বাঘিনী আস্তে গর্জন করে বাচ্চাটাকে ছোট একটা চড় মারলো। সামান্য চড়ে বাচ্চাটা গড়িয়ে সরে গেল। বাঘিনী আগের মত স্থির হয়ে বসে রইল। বাঘিনী মাটির সঙ্গে আরও চেপে বসে রইল। প্রকাণ্ড মাথাটা সামনে ছড়ান, দুটো থাবার মাঝখানে নামিয়ে আনলো। লেজের ডগাটা একটু কাঁপতে লাগলো। বাচ্চাগুলো মায়ের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী নকল করছে। এই সময়ে শব্দ শোনা গেল। খুবই মৃদু শব্দ। কোথায় যেন একটা পাথর সরে গেল। শব্দটা আরও বেশি করে শোনা গেল। একটু পরে শব্দ শুনে মনে হলো, কোন জন্তু যেন খুব সাবধানে খুব ধীরে, ওরা যে রাস্তা দিয়ে এসেছে, সেই রাস্তা দিয়ে আসছে। বাঘিনী পিছনের পা দুটো আরও গুটিয়ে বসলো। লেজের ডগাটা ডাইনে বাঁয়ে দোলাতে লাগলো। সমস্ত শরীরটা সামান্য কাঁপছে। জানোয়ারটা পায়ের শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এলো। জানোয়ারটা এখন প্রায় নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। বাঘিনীর শরীরটা সামনে পেছনে সামান্য দুলছে। বাচ্চাগুলি বুঝতে পারছে না যে, মা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ডোরা কাটা শরীরটা হঠাৎ স্প্রীং-এর মত বাতাসের মধ্যে ছিটকে উড়ে গেল। গায়ে বাদামী চামড়ার উপর সাদা ফুটকি দেওয়া সুন্দর একটা চিতল হরিণ জল খেতে ডোবায় আসছিল। জলের ধারে ঝোপে যে বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে, হরিণটা জানত। বাঘ থাকতে পারে, প্যান্থার থাকতে পারে, অতি হিংস্র বুনো বাইসন লুকিয়ে

এরপর ৭ পাতায়

সুন্দরবনের বাঘ

৩ পাতার পর

থাকতে পারে, চোরা শিকারী বন্দুক হাতে ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করতে পারে। এ সবই হরিণটা জানত। অনেকক্ষণ ধরে হরিণটা হাওয়া শুঁকেছে, কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করেছে। এদিকে আবার অসম্ভব তৃষ্ণাও পেয়েছে। ডোবার অন্যদিক ধরে আসবার কথাও ভেবেছিল কিন্তু ওপারে এত নিবিড় বন যে, ভেদ করে আসা সম্ভব নয়। তাই সে পা দিয়ে শব্দ করেছে। পথের পাশের বুনো গাছে গা ঘসে সাড়া তুলেছে এই আশায় যে, যদি কোন শত্রু লুকিয়ে থাকে তাহলে সে বেরিয়ে আসবে। সে পালাতে পারবে। কোন জানোয়ার যখন দেখা দেয়নি, কোন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায়নি, তখন ধরে নেওয়া গেছে যে ডোবার ধার নিরাপদ।

"হঠাৎ ভীষণ গর্জন ও বাতাসের মধ্যে দিয়ে বাঘিনীর উড়ে আসার শব্দে হরিণটা চকিতে পিছনে ফিরলো। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। ছোটা শুরু করার আগেই বাঘিনী হরিণের পিঠের উপর আছড়ে পড়লো। মনে হলো হাজার কেজি ভর তার উপর চেপে বসল। বড় বড় দাঁতের বজ্রের মত কামড়ে ঘাড়ে চেপে বসল। বড় বড় নখ লাগান বিরাট থাবা দুটো হরিণের দুই কাঁধে আটকে গেল। 'আর্‌র, আর্‌র আঈ ঈ ঈ' একটা আর্তনাদ হরিণের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল। পিঠের উপর গুরুভার ওজন নিয়ে হরিণটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ঘাড় ভাঙার শব্দ হল, ঠিক যেন কে পিস্তল ছুঁড়লো। হরিণটার শেষ পা ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল।

"বাঘের বাচ্চাগুলো এসব দেখে প্রথম বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। ওরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে বাঘিনীর অতি মৃদু ডাক শোনা গেল। বাচ্চাগুলো সাবধানে মার কাছে এগিয়ে গেল। শিকারের কায়দা ভালভাবে শেখার আগে বাচ্চাদের বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। ছোট ছোট জানোয়ার পেলে কামড়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করত। তার ফলে অনেক জন্তু বাচ্চাদের দাঁতে-নখে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পালিয়ে যেত। যখন অভিজ্ঞতা বাড়লো, দেহে আরও শক্তি বাড়ল তখন লেপার্ডের মত গলা কামড়ে শিকার করা শুরু করলো। কিন্তু বাঘের আসল কায়দা হল ঘাড় ভাঙ্গা। এই কায়দা শিখতে বেশ সময় লাগলো। যখন বাচ্চাদের বয়স প্রায় দেড় বছর হল, দেহ ও বেশ ভারী হল, শক্তিও বেড়ে গেল, তখন ওরা বাঘিনীর কাছ থেকে আসল কায়দা রপ্ত করতে শিখলো। বাঘিনীর শিকারের কায়দা ওরা লক্ষ্য করতো। কিন্তু দেখে শেখার চেয়ে সহজাত প্রবৃত্তি ওদের বেশী সাহায্য করল। শিকারের পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দুই থাবার নখ কাঁধে বিঁধিয়ে শক্ত করে ধরতে হবে। মাথা বাড়িয়ে গলাটা কামড়ে উপরদিকে হ্যাঁচকা টানে ঘুরিয়ে দিতে হবে। সজোরে টান, বাঘের গুরুভার ও শিকারের নিজের ওজন সব সহ্য করতে না পেরে জানোয়ারটা উল্টে পড়ে যায়। এই উল্টে পড়ার সময়ে ঘাড়ে এত চাপ পড়ে যে, মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ভেঙ্গে যায়। জানোয়ারটা সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। কিন্তু তার পরেও গলা কামড়ে প্রায় এক মিনিট ধরে রাখে। এসব ওরা ক্রমে ক্রমে শিখে নেয়। ওরা এখন নিজেরা শিকার করতে পারে। এবার জঙ্গলের নিয়মানুযায়ী সময় ঘনিয়ে এলো, যে যার নিজের পথে চলবার পালা।"

বাঘ এখন বিপন্ন প্রাণীর পর্যায়ে এসে পড়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ইকোলজিতে ফুড বেন বা ফুড ওয়েবে বাঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাঘ বিনা কি হরিণের জনসংখ্যা রোখা যাবে? হরিণের সংখ্যা বেড়ে সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং বনের গাছপালা সাবাড় করে দেবে এমনকি বনের নিকটবর্তী ক্ষেতের শস্য খেয়ে ফেলবে। বন শেষ হয়ে গেলে পতঙ্গরা কিভাবে বাঁচবে? গাছপালা ছাড়া মাটির পূর্ণতা কোথায়? অনুর্বর জমিতে কিভাবে শস্য উৎপন্ন হবে? মাটি আলগা হয়ে গেলে পলি নদীতে পড়বে এবং নদীর বেড়ে পলি জমে সেচেরকাজে বাধা সৃষ্টি করবে। তাই ইকোলজিক্যাল পিরামিডের শীর্ষে বাঘ এক গুরুত্বপূর্ণ শিকারি।

বাঘের স্বাভাবিক সাধারণ খাদ্য হল হরিণ ও বুনো শুয়োর। এসব ছাড়া অন্য সুখাদ্য জোটে, যেমন গরু, মহিষ, হনুমান ইত্যাদি। বাঘের কোন অসুবিধা হয় না। যখন কোন জানোয়ার না পাওয়া যায়, তখন কাছাকাছি নদী, খাল বা অন্য কোন জলাশয় থাকলে, মাছ, কাঁকড়া দিয়েও খাওয়া চলে। এও না জুটলে ব্যাং অবধি চলে। যদি জঙ্গলে স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব হয়, বাঘ লোকালয়ে হানা দেয়। গরু মহিষ মারতে শুরু করে। এই সময়ে বাধা দিতে গিয়ে গ্রামের মানুষ ওদের হাতে মারা পড়ে। অথবা, গ্রামের কাছে কোন ঝোপে লুকিয়ে বাঘ, গরু, মহিষ মারবার সুযোগের প্রতীক্ষা করে সে সময় কোন লোক হঠাৎ সামনে গিয়ে পড়লে বাঘ ঘাবড়ে গিয়ে আক্রমণ করে। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী থাবার এক আঘাতই যথেষ্ট। মানুষ মেরে যদি বাঘ মাংস খায়, বাঘটা তখন মানুষ খেকো হয়ে যায়। বাঘ, সিংহ বা লেপার্ড একবার মানুষের মাংসের স্বাদ পেলে অন্য জানোয়ার শিকার করতে চা না। কারণ মানুষ মারা সহজ। যে জায়গায় মানুষ খেকো বাঘ রাজত্ব করে, সেখানকার লোকের ভয় ও বিপদের সীমা থাকে না। সাধারণভাবে বাঘ মানুষকে ভয় করে ও এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু মানুষের মাংসের স্বাদ পেলে, এদের একমাত্র খাদ্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষ। শিকারিদের গল্প পড়লে বোঝা যায়, কি ভয়ানক চাতুর্য ও সাহসের সঙ্গে এরা মানুষ শিকার করে।

কিন্তু দেখা যায়, সুন্দরবনের অধিকাংশ বাঘ মানুষ খেকো। অভিজ্ঞ শিকারিদের মতে, বাঘ যদি আহত হয়ে বা বয়সের জন্য দাপাদাপি ও ছোটাছুটি করতে না পারলে, স্বাভাবিক খাদ্য হরিণ, শুয়োর, গরু, মহিষ মারতে না পারে, তখন সেই বাঘটা মানুষ-খেকো হয়ে যায়। কারণ মানুষ মারা অতি সহজ। এই যুক্তির সপক্ষে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার সম্পূর্ণ সুস্থ সবল থেকেও মানুষ মারে ও খায়। একটা কারণ শিকারিরা বলে থাকেন সেটা হল মানুষ খেকো বাঘিনী বাচ্চাদের মানুষের মাংস খেতে অভ্যস্ত করে তোলে। মায়ের কাছে বাচ্চারা শেখে, মানুষ কত সহজে শিকার করা যায়। এইভাবে বংশ পরম্পরায় এরা জন্ম থেকে মানুষ খেকো বাঘে পরিণত হয়। অনেক শিকারি বলেন, বাঘ মৃত মানুষের দৃষ্টিকে ভয় পায়। খাওয়া শুরু করার আগে মৃত দেহটিকে উপুড় করে নেয়। খাবার সময়ে টানাটানিতে যদি চিৎ হয়ে যায়, বাঘ লাফিয়ে সরে যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে থাবা দিয়ে টেনে উপুড় করে নেয় যাতে মৃত মানুষের চোখের মুখোমুখি না হতে হয় এবং আবার খেতে শুরু করে।

একটা বাঘ কি করে মানুষ খেকো হল, শিকারির বর্ণনাতে বোঝা যায়। "হঠাৎ বাজ পড়ার মত বাঘটা পাথরের উপর থেকে গরুটার উপর লাফিয়ে পড়লো। গুরুভার বাঘের চাপে ও হিংস্র দাঁতের হ্যাঁচকা টানে গরুটা পড়ে গেল। একটা বিশ্রী শব্দ করে ঘাড় ভেঙ্গে গেল। বাঘটা কিন্তু গরুর গলা

এরপর ৮ পাতায়

সুন্দরবনের বাঘ

৭ পাতার পর

কামড়ে বসে রইলো। বাঁখাল রামু আপন মনে গান গাইতে গাইতে আসছিল। পথের বাঁক ঘুরতেই দেখলো, একটা বাঘ তাঁর গরুটার গলা কামড়ে বসে আছে। ভয় না পেয়ে রামু হাতের লাঠিটা আস্ফালন করলো। বাঘের মুখে তখন গরুর টাটকা রক্তের স্বাদ রয়েছে। এই সময়ে একটা মানুষ পিছন থেকে জ্বালাতন করছে। এতে বাঘটা বিলক্ষণ চটে গেল। মুহূর্তের জন্য পিছন ফিরে রামুর মাথায় একবার থাবা মারলো। ফট করে রামুর মাথার খুলিটা ডিমের মত ভেঙ্গে গেল। রামু মাটিতে পড়ে যাবার আগেই বাঘটা আবার গরুর গলা কামড়ে ধরলো। কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনা কমলে বাঘটা উঠে দঁড়ালো। কিন্তু প্রশ্ন হল, ওই যে মানুষটা (রামু) পড়ে আছে, তাকে এখন কি করা যাবে।

"এতদিন সে মানুষকে ভয় করে এসেছে, কারণ ইস্পাতের যাঁতি কলে তার আহত হবার পিছনে এই দ্বি-পদ জানোয়ারটার ভূমিকা কম নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল একটামাত্র থাবার আঘাতে অর্থাৎ সামান্য বলপ্রয়োগে এমন ঘটনাটা ঘটে গেল। কেননা মানুষ প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী। মানুষটাকে খেয়ে দেখতে বাঘের খুব লোভ হল। যদি ভালো লাগে, বুঝতে হবে, সহজে শিকার করা যায়। অথচ খেয়েও আরাম। এইরকম একটা জানোয়ার পাওয়া গেল। বাঘ একটু মাংস খেয়ে দেখলো। তারপর রামুর মৃতদেহের উপর দুই থাবা রেখে বসে পড়লো। বুক পেট থেকে মাংস ছিঁড়ে খেতে লাগলো। জন্ম হল একটি মানুষ খেকো বাঘের। শিকারির গুলিতে মারা পড়ার আগে আশী জন মানুষকে এই বাঘ মেরেছিল।"

এক বছরে একটা বাঘের জীবনধারণের জন্য ৫০-৬০টি গরুর বা সমান ওজনের হরিণের প্রয়োজন হয়। এই বাঘের হিতাকাঙ্খা বাস্তুসংস্থানের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সমার্থক। এক লাফে ৬০ ফুট যেতে পারে। এক লপ্তে ৩০ কেজি মাংস খেতে পারে। দু'তিন দিন না খেয়েও থাকতে পারে। শ্রবণশক্তি প্রচণ্ড। রাতে দৃষ্টিশক্তি মানুষের চেয়ে ছয়গুণ বেশি। তাই রাতে শিকারে বেরোয়। মানুষের ফিংগার প্রিন্ট যেমন এক হয় না, তেমনি বাঘের গায়ের ডোরা কাটা হলুদ ও কালো রং এক হয় না। বাঘের লালা, অ্যান্টিসেপটিক এবং ক্ষত পরিষ্কার করতে ব্যবহার করে। দিনে ১৮ ঘণ্টা ঘুমোয়। বাঘের ডাক দু'মাইল দূর থেকে শোনা যায়।

বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ আসে। বাঘের জোড়া বাঁধবার সময়। বাঘিনীর আমন্ত্রণ পাহাড়ে জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। উ উ্ হ্ গ্ হ্। উ উ্ ঙ্ গ্ হ্। আ উ উ্ ঙ্ গ্ হ্। বাঘ ডাক শুনে সাড়া দেয়। বন-জঙ্গল ভেদ করে বাঘিনীর কাছে চলে আসে। কিন্তু শান্তিতে জোড় বাঁধা বড় একটা হয়ে ওঠে না। বনে আরও বাঘ থাকে। শিকারির ভাষায়— 'তরুণ বাঘটা বাঘিনীর আহ্বান শুনতে পেল। ক্রমাগত গোঙানির মত ডেকে বাঘিনী আহ্বান জানাল। তরুণ বাঘটা দূর থেকে গর্জন করে সাড়া দিল। বাঘিনীর আহ্বান লক্ষ্য করে জঙ্গলের ভিতর থেকে এগিয়ে আসতে লাগলো। বাঘিনীটা একটা ঝোপের আড়ালে বসেছিল। বাঘটা সহচরীর সঙ্গে চার পাঁচ দিন বেশ আনন্দে কাটালো। সহসা একদিন আর একটা বাঘ এসে হাজির হল। ফিকে হয়ে আসা রঙ দেখে বোঝা যায় তার যৌবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই বাঘটা তরুণ বাঘের থেকে বড়। বয়স্ক বাঘটা চুপ করেএকটু দাঁড়িয়ে ওদের দেখলো। হঠাৎ ভয় পাওয়ানোর মত গর্জন করে উঠলো। তরুণ বাঘটাও গর্জন করলো। বাঘিনীও গর্জন করে উঠলো। বয়স্ক বাঘটা ওদের দুজনকে দেখলো। বাঘিনীর বয়স কম। বাঘটাও তরুণ। কোন সন্দেহ নেই যে, লড়াইতে কম বয়সী বাঘটা হেরে যাবে। যদি সেরকম তর্জন-গর্জন করতে পারে, হয়তো লড়াইয়ের ঝামেলাই হবে না। তরুণ বাঘটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে। বয়স্ক বাঘটা আরও জোরে গর্জন করে উঠলো। ভয় দেখবার জন্য ভীষণ গর্জন করতে করতে করতে বয়স্ক বাঘটা এক পা এক পা করে তরুণ বাঘটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু বয়স্ক বাঘটার হিসেবে একটু ভুল ছিল। তরুণ বাঘটার বয়স কম হলেও বেশ কঠিন ধাতের জীব। কান দু'টো পিছনে হেলিয়ে তরুণ বাঘটা বিকট গর্জন করলো। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। বয়স্ক বাঘটা কয়েক গজ দূরে আসতেই তরুণ বাঘটা প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণ করলো। অনেক লড়াইয়ে অভিজ্ঞ কৌশলী বয়স্ক বাঘ, চট করে এক পাশে সরে প্রচণ্ড থাবা মেরে লাফিয়ে উঠে তরুণ বাঘটার ঘাড় কামড়ে ধরলো।

"যদি তরুণ বাঘটা একটু কমজোরী হত তা হলে লড়াইতে তখনি হেরে যেত। সে জোরে ডিগবাজী খেলো। বয়স্ক বাঘটা মাটিতে ছিটকে পড়লো। পড়বার সময়ে বোধহয় কামড়টা একটু ঢিলা হয়েছিল। সেই সুযোগে তরুণ বাঘটা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ঘাড়ে হল এক বিরাট ক্ষত।

বয়স্ক বাঘটা সামলে নেবার আগেই তরুণ বাঘটা বিদ্যুতের বিদ্যুতের মত কান ও গলার মাঝখানটা বজ্র কামড়ে ধরে নিল। তারপর দুই বনের রাজা থাবার আঘাতে পরস্পরকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে রক্তাক্ত করতে লাগলো। তরুণ বাঘটা এত ভয়ঙ্করভাবে কামড়ে রেখেছে যে বয়স্ক বাঘটা ঠিক সুবিধে মত লড়তে পারছিল না। এই ভীষণ লড়াইয়ের সময় বাঘিনী কখনো চুপ করে বসে লড়াই দেখেছে নতুবা কখনো দুই যোদ্ধার চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। বয়স্ক বাঘটা ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলো। বয়সের বোঝা তারুণ্যের কাছে ধীরে ধীরে পরাজয় স্বীকার করতে লাগলো। অবশেষে তরুণ বাঘের দাঁত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। চামড়া ছিঁড়ে মাথার খুলির হাড় খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে। তরুণ বাঘটা বড় বাঘটাকে মেরে ফেলার জন্য ক্ষেপে উঠলো। বাঘেদের এটাই নিয়ম, হয় তুমি মরবে, না হয় আমি মরবো। মাথাটা ছাড়িয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বড় বাঘটা পালাতে লাগলো। তরুণ বাঘটা পিছনে তাড়া করে আঁচড়ে কামড়ে রক্ত ঝরাতে লাগলো। এই সময় বাঘিনী মৃদু গর্জন করে উঠলো।

—ভোলানাথ দত্ত, ফোন: ০৩৩-২৩৫৮৭৩৩৫

অবশিষ্টাংশ আগামী সংখ্যায়

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ০৩৩-২৮৭৬০৭২০, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০০৯২ ।

সম্পাদক মণ্ডলী— সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদক– শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন : ৯৪৩৩৩৪৩৮০)

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.